এই সময়
সংবাদপত্র

* কথাসরিৎ *

সব কিছুরই নানা ব্যাখ্যা হয়। কোন ব্যাখ্যাটি গ্রাহ্য হবে, সেটি সত্য নয়, ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

— ফ্রিডরিশ নিৎশে

দ্বৈরথ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক দ্বৈরথ ক্রমেই ভিন্নতর মাত্রা লাভ করছে। তৃণমূল কংগ্রেস যদিও আঞ্চলিক দল থেকে জাতীয় দলের স্বীকৃতি পেয়েছে কিছুকাল আগে, কিন্তু জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা যে ভাবে পুরোভাগে এগিয়ে এসেছেন তার নজির সাম্প্রতিক কয়েক বছরের ইতিহাসে মিলবে না। গত বছর ৮ নভেম্বর রাতে প্রধানমন্ত্রী বিমুদ্রাকরণের ঘোষণার পরে মমতাই সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, তার পরে বিভিন্ন বিরোধী দলের তরফে যে সমবেত প্রতিবাদের আয়োজন করা হয় সংসদের ভিতরে এবং বাইরে, সেখানেও নেত্রীর নির্দেশে তৃণমূল রাজনীতিকেরা যথেষ্ট তৎপর ভূমিকা পালন করেছেন। এর কিছুকাল পরে চিটফান্ড সংক্রান্ত মামলায় যথাক্রমে তাপস পাল এবং তার পর যথেষ্ট ওজনদার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করার পরে প্রত্যাশিত ভাবেই তৃণমূলের তরফে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কথা বলা হয়েছে— যদিও এই কাণ্ডের ভিতর থেকে যে রাজনৈতিক সারাৎসারটি বেরিয়ে আসে তা হল, বিরোধী পক্ষের মুখ হিসাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বেছে নিয়েছে। সিবিআই গ্রেপ্তারি সংক্রান্ত যাবতীয় অস্বস্তি সত্ত্বেও অন্তত এই তথ্যটুকু তৃণমূল নেত্রীর পক্ষে সবিশেষ অবাঞ্ছিত নয়। রাহুল গান্ধীর নানাবিধ কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদীর সরকার যদি মুখ্য বিরোধী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ভাবে, তা তৃণমূল নেত্রী পুনর্বার জাতীয় স্তরে অভিযানকেই আরও জোরদার করবে নিশ্চিত। এর আগে তিনি কেন্দ্রে একাধিকবার মন্ত্রী হয়েছিলেন বটে কিন্তু এমন ভাবে জাতীয় স্তরের রাজনীতির পুরোভাগে তাঁকে দেখা যায়নি। সে হিসাবে নরেন্দ্র মোদী সরকারের তরফে বিবিধ তৎপরতাকে মমতা যদি এমনকী আক্রমণ বলেও ভেবে নেন, সে আক্রমণও তাঁর কাছে এক ধরনের স্বীকৃতির তুল্য বইকি।

এই দ্বৈরথ যে জমে উঠেছে তা উভয় শিবিরে সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট। মমতা যেমন কেন্দ্রে সরাসরি তথাকথিত জাতীয় সরকার গঠনের ডাক দিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন, সরকারের শীর্ষ পদে দেখতে চেয়েছেন লালকৃষ্ণ আদবানি, রাজনাথ সিং বা অরুণ জেটলিকে, ঠিক তার পরেই সেই জেটলিই আবার তীব্র আক্রমণে বিঁধেছেন পশ্চিমবঙ্গকে। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কে, তা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। বিজেপি কর্মসমিতির বৈঠকে অমিত শাহ পুনরায় নাম না করে চিটফান্ড সংক্রান্ত তোপ দেগেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ দ্বৈরথ এ বার ক্রমে তীব্র ও সূচিমুখ হয়ে উঠছে। পরিণাম সময়ই বলবে।

ক্ষতিপূরণ

দেশের শীর্ষ আদালত মধ্যপ্রদেশ সরকারকে সম্প্রতি তিরস্কার করেছে। সেই রাজ্যে নানা ধরনের ছোটো বড়ো বাঁধ বানানোর প্রকল্পগুলির অধিগৃহীত জমি থেকে উচ্ছিন্ন মানুষগুলি ক্ষতিপূরণ বাবদ হাতে টাকা পেয়েছেন বটে, তবে বৃহৎ আয়তনের বাঁধগুলির ক্ষেত্রে যেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে ছোটো বাঁধের আওতাভুক্ত মানুষগুলির জন্য মাত্র এগারো হাজার টাকা ধার্য হয়েছে। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ যে শীর্ষ আদালতের নজর এড়ায়নি সে কথা সাফ বাতলে দেওয়াও হয়েছে। সমস্যা হল, শীর্ষ আদালত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত নির্দেশনামা জারি না করলে সরকারি আধিকারিকদের মাথায় হয়তো উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনগুলিকে ফের একবার ঢেলে সাজিয়ে নতুন করে বাঁচার উপায় সন্ধান

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এখন জাতীয় রাজনীতিতে বিমুদ্রাকরণ এবং মোদীবিরোধী আন্দোলনের প্রধান মুখ

আটের দশকের বাম = হাল আমলের তৃণমূল?

বামফ্রন্টের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর যুগলবন্দির স্মৃতি ফিরে আসছে তৃণমূলের কেন্দ্রবিরোধী রাজনীতির মধ্য দিয়ে। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

গত ৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিমুদ্রাকরণের নীতি ঘোষণা করার পরে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে ওই নীতির বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি রাজনৈতিক সুর ছড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রীর বিমুদ্রাকরণের নীতি মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রকে সমস্যায় ফেলেছে। সেই দিকে নজর দিয়ে তৃণমূল এই বিমুদ্রাকরণের নীতির বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি সোচ্চার। অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে তৃণমূলের এই রকম রাজনৈতিক আক্রমণ কিন্তু গত এক দশকে আরও বেশ কয়েকটা ইস্যুর ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে। সেই বিষয়গুলো মনে রাখলে এ কথা অনস্বীকার্য যে গত দশ বছরে তৃণমূলের একটা রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটেছে। রাজ্যের বর্তমান শাসক দল গত দশ বছরে এমন কিছু ইস্যু নিয়ে লড়াই আন্দোলন করেছে বা এমন কিছু নীতির বিরোধিতা করেছে যা মূলত এই রাজ্যে গত শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশকে বামেদেরকে মানুষ করতে দেখেছে। তৃণমূলের প্রথম পর্বের (১৯৯৮ লোকসভা থেকে ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত) সঙ্গে তাই রাজনৈতিক ভাবে দ্বিতীয় পর্বের (মূলত ২০০৬ সালের সিঙ্গুর আন্দোলন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত) বিশেষ পার্থক্য আছে। তৃণমূলের প্রথম পর্বে তাদের রাজনৈতিক ভাবে বিজেপির সঙ্গে সখ্য বেশি ছিল। রাজ্যে ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে তারা লোকসভা ও বিধানসভা মিলিয়ে মোট পাঁচটা নির্বাচনের মধ্যে চারটে নির্বাচনেই বিজেপির সঙ্গে নির্বাচনী জোট করেছিল। ২০০৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল শেষ বিজেপির সঙ্গে নির্বাচনী জোট করেছিল।

তার পর ২০০৬-০৭ সাল থেকেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বের সময় জমি প্রশ্নে (বিশেষ করে এসইজেড এবং বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে) তারা কৃষক ও কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল মানুষের স্বার্থ বৃহৎ কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থের থেকে বেশি রক্ষা করেছে। তার সঙ্গে বিগত ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূল ক্রমাগত বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পেট্রোল-ডিজেল-সার-এলপিজির দাম বৃদ্ধি ও মাল্টিব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই তারা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-২ সরকার থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-২ সরকার থেকে তৃণমূলের সমর্থন প্রত্যাহার কিন্তু নির্বাচনী প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ছিল না। কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়েও রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূলের বাড়তি কোনও অসুবিধে হত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃণমূল মাল্টিব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ইউপিএ-২ সরকার ত্যাগ করেছিল। কারণ রাজ্যের শাসক দল খুব ভালো করেই জানত যে সব থেকে বড়ো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের (অসংগঠিত ক্ষেত্রের) স্বার্থ, যা মাল্টিব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হত, তা মাথায় না রাখলে আখেরে ভোটের বাক্সে বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে। অন্য দিকে সাম্প্রতিক অতীতে প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা তৃণমূল একাধিকবার বিরোধিতা করেছে। এ হেন রাজনৈতিক অবস্থান 'আদি' তৃণমূলের সময়ে দেখা যায়নি।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউপিএ-২ সরকার ত্যাগ করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস অথবা বিজেপি যেই থাকুক না কেন, তৃণমূল মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করার দাবিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী রাজনীতি করে চলেছে। সম্প্রতি বিমুদ্রাকরণের নীতির প্রশ্নে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যথার্থ বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গ আরও বেশ কয়েকটা রাজ্যগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রের জিএসটি কর মেনে নিয়েছিল এই ভেবে যে রাজ্যের অর্থনীতিতে মাত্র এক বার অভিঘাত হবে। এই জিএসটি কর লাগু হলে এমনিতেই কর আদায় করার ক্ষেত্রে রাজ্যের আর তেমন কোনও স্বাধীনতা থাকবে না। কিন্তু যে ভাবে রাজ্যগুলোর সঙ্গে পরামর্শ না করে বিমুদ্রাকরণের নীতি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হল তাতে রাজ্যগুলোর আর্থিক বৃদ্ধি কমবে এবং সরাসরি রাজ্যগুলোর রাজস্বের পরিমাণ কমবে। সেই রাজস্ব কমলে রাজ্যের উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য।

> সাম্প্রতিক অতীতে প্রতিরক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে তা তৃণমূল একাধিকবার বিরোধিতা করেছে। এ হেন রাজনৈতিক অবস্থান 'আদি' তৃণমূলের সময়ে দেখা যায়নি।

তৃণমূলের এই কেন্দ্র-বিরোধী রাজনীতি কিছুটা ১৯৮০র দশকে বামফ্রন্টের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর যুগলবন্দি নেতৃত্বের কথা মনে করিয়ে দেয় যখন কিছু আঞ্চলিক দলগুলোকে নিয়ে তারা রাজ্যগুলোর অনেক ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। অন্য দিকে, অন্তত দুটো বিষয়ে (জমি প্রশ্ন এবং মাল্টিব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ) পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই(এম)-এর প্রধান দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই বিভ্রান্তি আছে। পশ্চিমবঙ্গ সিপিআই(এম)-এর প্রধান সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী জমি প্রশ্নে কৃষক স্বার্থের থেকে বড়ো পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে বেশি আগ্রহী। তাই বড়ো শিল্প ও অনেক ক্ষেত্রে এসইজেড গড়ার ক্ষেত্রে পূর্বতন বাম সরকার বর্তমান রাজ্য সরকারের থেকে বেশি মুখিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ত, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পূর্বতন বাম সরকারের প্রধান শরিক অনেক বেশি আগ্রহী ছিল। এখানে বামেদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব ও কিছু ছোটো বাম শরিক কোনওক্রমে ওই নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের ক্ষেত্রে গত এক দশকে এই দুই বিষয়ে অন্তত একটা ধারাবাহিকতা আছে। তাই আজ খুব পরিষ্কার করে বলা যায় যে গত দশ বছরে তৃণমূল একটা মধ্য-দক্ষিণপন্থী রাজনীতি ছেড়ে ক্রমাগত একটা মধ্য-বামপন্থী জনমোহিনী রাজনীতি করছে। কিন্তু আশি ও নব্বইয়ের দশকের বামেদের সঙ্গে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল দুর্নীতির প্রশ্নে। আশি ও নব্বইয়ের দশকের বামফ্রন্ট নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির এ রকম ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠত না। সেই সময় রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির অভিযোগে এ রকম বার বার জেলে যেতে দেখা যায়নি।

কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও তা তৃণমূলকে রাজনৈতিক ভাবে বেকায়দায় ফেলছে না এবং একের পর এক নির্বাচনে তারা প্রচুর আসন পেয়ে জয়ী হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে রাজ্যের বিরোধীদের রাজনৈতিক ও নির্বাচনী পরাজয়ের বড়ো কারণ হল দুর্নীতির প্রশ্নে ধারাবাহিক ভাবে লেগে থেকে তাদের আন্দোলন বিমুখতা। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হোক আর না হোক, কিন্তু দুর্নীতিকে রাজনৈতিক ইস্যু করে যে সাফল্য এসেছে ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল এবং সম্প্রতি দিল্লিতে আম আদমি পার্টির উত্থান তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু এই দুই উজ্জ্বল উদাহরণের পাশে ভারতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতির এমন অনেক অনুজ্জ্বল কীর্তি আছে যা দেখে মনে পড়ে যায় সত্যজিৎ রায়ের 'শাখা প্রশাখা' ছবির এক দৃশ্য যেখানে বলা হচ্ছে 'দু-নম্বরি নিয়ে আজ আর কেউ কথা বলে না। ওটা সবাই মেনে নিয়েছে'।

এ ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে ইন্দিরা গান্ধীর সময়কাল থেকে ভারতীয় রাজনীতির বিগত সাড়ে চার দশকের একটা স্থায়ী লক্ষণ হল, যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার মানে দাঁড়িয়েছে বহু ক্ষেত্রে নিয়ম না মানা এবং আর্থিক কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েও দেশের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো। গত সাড়ে চার দশক জুড়ে ভারতীয় রাজনীতির একটা ট্র্যাজিক দিক হল যে, এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যায় যেখানে জনগণের ভোটে বা জনতার আদালতে জিতলেই সাত খুন মাফ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে আইনের শাসনের সঙ্গে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল জনপ্রতিনিধির একটা বিরোধ দেখা দিচ্ছে। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলাপ, আলোচনা, বিচার-বিতর্ক করে সুচিন্তিত কার্যের জায়গা সীমিত হয়ে যাচ্ছে কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন ক্রমেই সংখ্যাতন্ত্রে পরিণত হয়েছে যেখানে সংখ্যাগুরু জনগণের ভোট নিয়ে জিতলেই যেন আর কোনও বিষয়ে ভাবার দরকার নেই। যুক্তিবিরুদ্ধ কোনও নীতি বা আইনি সমস্যা জর্জরিত নীতি (যেমন বর্তমান বিমুদ্রাকরণের নীতি) গ্রহণের ক্ষেত্রেও সেই ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি হবে।

সেই দিক থেকে আগামী মাসে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার পাঞ্জাব, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, মনিপুর ও উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার মধ্যে ভারতের সব থেকে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিজেপি যদি উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয় তা হলে আগামী দিনে রাজ্যসভায় তাদের সুবিধা হবে কারণ এখনও তাদের রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সমাজবাদী পার্টির মধ্যে যে বিভাজন স্পষ্ট হয়েছে তাতে বিজেপি ও বিএসপি-র কিছুটা সুবিধা হবে। তবে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সব থেকে বড়ো দুর্বলতা হল এখনও পর্যন্ত অখিলেশ যাদব বা মায়াবতীর মতো তাবড় কোনও মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। অন্য দিকে বিমুদ্রাকরণের নেতিবাচক প্রভাব কতটা এই ভোটে পড়বে এবং এই ইস্যুতে বিরোধীরা কেমন প্রচার করবে সেই বিষয়ে বিজেপি কেন অনেক বোদ্ধাই এখনও জানেন না। কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে একা লড়লে গোহারান হারবে। তারা এই নির্বাচনে বিহারের মতো বিজেপি বিরোধী একটা জোট করলেই লাভের গুড় খেতে পারে। তাই উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যদি কংগ্রেস ও অজিত সিংহের রাষ্ট্রীয় লোক দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট করে তা হলে সেই রকম একটা মহাজোটের জয়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের আগে অনেক প্রাক নির্বাচনী সমীক্ষা হবে ও নির্বাচন সমাপ্ত হলে আরও বেশ কিছু এক্সিট পোল হবে। সেইগুলো নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানোই ভালো। কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ভারতের নির্বাচনী রাজনীতির জটিল অঙ্ক ও রসায়ন তারা অনুমান করতে পারে না। লাগলে তাক না লাগলে তুক। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েক বার হয়তো 'মিত্র' বলে ভোটারদের সম্বোধন করবেন। তবে উত্তরপ্রদেশের জনগণ প্রধানমন্ত্রীকে শত্রু ভাবেন, না মিত্র, তা একমাত্র ১১ মার্চ ফল প্রকাশের দিন জানা যাবে। কেন্দ্রের শাসক দল উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন জিতলে তারা বিমুদ্রাকরণের সাফল্যের কথা বলবে, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা; পারদর্শিতা ও জনপ্রিয়তার ঢক্কানিনাদ করবে। আর বিজেপি উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন হারলে বিরোধীদের 'মোদী হটাও' স্লোগান আরও জোরদার হবে। আর সেই স্লোগানকেই হাতিয়ার করে জাতীয় রাজনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য মুখিয়ে আছে বাংলার 'নব্য' তৃণমূল।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক